 ISSN 2789-1062 /

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন*

কৃষ্ণপুর গণহত্যা

[**সারাংশঃ** এই গবেষণায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে সংঘটিত গণহত্যার প্রকৃতি, প্রেক্ষাপট, ব্যাপ্তি ও দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনি ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে কৃষ্ণপুর ও পার্শ্ববর্তী হিন্দু অধ্যুষিত পাড়াগুলো ঘেরাও করে গ্রামবাসীর পালানোর পথ বন্ধ করে দেয়। এরপর বাড়িঘরে তল্লাশি চালিয়ে নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধসহ নিরস্ত্র মানুষদের ধরে পৃথক পৃথক স্থানে নিয়ে হত্যা করা হয়। গোকুলনগর, চণ্ডীপুর, লালচাঁনপুর, গদাইনগর ও গঙ্গানগরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে প্রায় ১২৭ জন নিহত হন; তাঁদের মধ্যে মাত্র ৪৫ জনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণায় বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে যে, ধর্মীয় পরিচয়, স্থানীয় সহযোগিতা, পরিকল্পিত অবরোধ, নির্বিচার হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং নারীদের ওপর যৌন সহিংসতাড়সব মিলিয়ে কৃষ্ণপুরের ঘটনা ছিল পাকিস্তানি বাহিনির বৃহত্তর দমন ও নিধননীতির একটি স্থানীয় প্রকাশ। গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ও বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মৃতি, শহিদদের পরিচয়, হত্যাস্থল এবং পরবর্তী সময়ে বধ্যভূমি ও স্মৃতিস্মারক প্রতিষ্ঠার বিষয়ও গবেষণায় গুরুত্ব পেয়েছে। একই সঙ্গে ২০১০ সালে দায়ের হওয়া মামলা এবং পরবর্তী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষ্ণপুর গণহত্যার বিচারিক স্বীকৃতি ও দায়বদ্ধতার প্রচেষ্টাও আলোচিত হয়েছে।]

সূচকশব্দ : কৃষ্ণপুর, গণহত্যা, পাকিস্তান বাহিনি, বধ্যভূমি

* *অধ্যক্ষ, জহুর চান বিবি মহিলা কলেজ, হবিগঞ্জ*

ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলা একটি শান্ত ও গ্রামীণ জনপদ। এই উপজেলারই একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম হলো কৃষ্ণপুর গ্রাম। গ্রামটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার জন্য পরিচিত।

লাখাই উপজেলার মানচিত্র *সৌজন্যে: বাংলাপিডিয়া*

১০ জানুয়ারি ১৯২২খ্রি. লাখাই থানা গঠিত হয়। আয়তন ও অবস্থান : ২৪’১৩- ২৪’ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১’১০-৯১’-২১ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে লাখাইর অবস্থান। মূল লাখাই থেকে উপজেলা সদর কালাউক নামক স্থানে স্থানান্তরের ফলে মূল লাখাইর গুরুত্ব কমে যায়। আয়তন ২০৮কি.মি.। লাখাই উপজেলার উত্তরে বানিয়াচং উপজেলা, দক্ষিণে মাধবপুর, ব্রাম্মণবাড়িয়া সদর ও নাসিরনগর

উপজেলা। পূর্বে হবিগঞ্জ সদর উপজেলা ও পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম। নদী বা জলাশয় মেদির টিক্কাপুর, রবির গোল, কচুয়া, গথরিয়া ও মুড়িয়াউক হাওর। ইউনিয়ন ও গ্রাম : ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে লাখাই উপজেলা গঠিত। ইউনয়িনগুলি হলো : লাখাই, মুড়াকরি, মড়িয়াউক, বামৈ, করাব ও বুল্লা। এ উপজেলায় ৭০টি মৌজা ও ৬৬টি গ্রাম রয়েছে। লাখাই সংসদীয় আসন হবিগঞ্জ-৩ এর অন্তর্গত। কৃষ্ণপুর গ্রামের উত্তরে লাখাইর সন্তোষপুর, পুর্বে মুরাকড়ি, দক্ষিণে বলভদ্র নদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গঙ্গানগর এবং পশ্চিমে বিবাড়িয়ার রামপুর,গোয়ালনগর ও মেঘনা নদী।

তৎকালীন অবস্থা

১৯৭১ সালের সেই ভয়াল দিনগুলোতে কৃষ্ণপুর গ্রাম ছিল এক শান্ত, স্নিগ্ধ, হিন্দু অধ্যুষিত জনপদ। যেখানে ভোর হতো পাখির কলতানে, আর সন্ধ্যা নামত প্রদীপের আলো আর শঙ্খধ্বনিতে। মানুষের জীবন ছিল সরল, প্রকৃতিনির্ভর এবং শান্তিপূর্ণ। গ্রামে অনেক ধনাঢ্য পরিবার ছিল। অনেক ব্যবসায়ী । একাত্তরে কৃষ্ণপুর গ্রামের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ লোক শিক্ষিত ছিল। এ গ্রামের বাসিন্দা এলএম এফ ডাক্তার অবিনাশ চন্দ্র রায়, তুষার কান্তি রায়, মৃনাল কান্তি রায়, বিজয় কৃষ্ণ রায়, অমরেন্দ্র রায়, ননী গোপাল রায়, প্রিয়তোষ রায় মঞ্জু তখনই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত।

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বলভদ্র নদীর তীর তখনও ছিল নির্জন, নিস্তব্ধ আর প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় ভরা। নদীর ধারে বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড় আর খোলা চরভূমি। যেখানে দিনের বেলায় শিশুরা খেলত, কৃষকরা বিশ্রাম নিত, আর জেলেরা জাল ফেলত। কিন্তু সেই পরিচিত দৃশ্য একদিন হঠাৎ করেই বদলে যায়।

পাকা রাস্তা কিংবা আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে গ্রামটি ছিল অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতাই যেন কাল হয়ে দাঁড়ায় গ্রামবাসীর জন্য। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি তাদের এদেশীয় দোসরদের সহায়তায় যখন গ্রামে প্রবেশ করে, তখন চারদিকে নেমে আসে অজানা আতঙ্কের ছায়া।

নির্জন নদীতীর, ঝোপঝাড়ে ঢাকা ফাঁকা জায়গা আর বসতবাড়ি থেকে দূরের নিরিবিলি স্থানগুলো মুহূর্তেই পরিণত হয় মৃত্যুর মঞ্চে। নিরপরাধ মানুষদের ধরে এনে আলাদা আলাদা জায়গায় দাঁড় করানো হয়। চারদিকে তখন শুধু

আর্তচিৎকার, কান্না আর ভয়ের নিঃশব্দ বিস্তার। কেউ পালানোর পথ খুঁজে পায়নি, কেউ সাহায্যের জন্য পৌঁছাতে পারেনি।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা

সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার দিক থেকে কৃষ্ণপুর পূর্ব থেকেই ব্যাপক পরিচিত ছিল। কৃষ্ণপুরের একটি ঐতিহ্য ছিল 'যাত্রাগান'। এ গান পুরো জেলার সাংস্কৃতিকপ্রেমীদের আকর্ষণ করতো তখন। কৃষ্ণপুরের ফুটবল খেলার মাঠ ছিল ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিখ্যাত। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চারটি মন্দির, চারটি পুকুর ছিল কৃষ্ণপুরে। একাত্তরে এসব পুকুরের কচুরিপানার নিচে আশ্রয় নিয়ে কিছু মানুষ জীবন বাঁচিয়ে ছিল। কৃষ্ণপুরের চকবাজারটি ছিল সে সময়ে কেনা-কাটা, সময় কাটানো ও ভাব বিনিময়ের অন্যতম স্থান।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কৃষ্ণপুর গ্রাম এবং এর আশপাশের এলাকা ছিল চরম অনিশ্চয়তা, ভয় এবং অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত। চারদিকে যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও গ্রামীণ এই জনপদে মানুষ প্রথমদিকে সম্পূর্ণ পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারেনি।

লাখাই উপজেলা-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে তখন পাকবাহিনির দখলদারিত্ব ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছিল। স্থানীয় কিছু দোসর ও রাজাকারদের সহায়তায় তারা বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালাত, বিশেষ করে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে টার্গেট করত। ফলে কৃষ্ণপুর গ্রাম এবং এর আশপাশের গ্রামগুলোতে আতঙ্ক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামসংলগ্ন বলভদ্র নদী ও আশপাশের ফাঁকা জমি, ঝোপঝাড় ও নির্জন স্থানগুলো তখন নিরাপত্তাহীন হয়ে ওঠে। দিনের বেলাতেও মানুষ আতঙ্কে ঘর থেকে বের হতে সাহস পেত না। রাত নামলে ভয়ের মাত্রা আরও বেড়ে যেত কখন, কোন দিক থেকে হানাদার বাহিনি এসে পড়বে, সেই আশঙ্কায় মানুষ নির্ঘুম রাত কাটাত।

যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা ছিল পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। আশপাশের গ্রামগুলো একে অপরের সঙ্গে তেমনভাবে সংযুক্ত না থাকায় দ্রুত খবর পৌঁছানো বা সাহায্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। ফলে কোনো এলাকায় হামলা হলে অন্যরা আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পেত না।

এছাড়া, স্থানীয় সহযোগীদের কারণে শত্রুপক্ষ সহজেই গ্রামের অভ্যন্তরীণ তথ্য পেয়ে যেত কে কোথায় থাকে, কোন পরিবার হিন্দু, কারা তুলনামূলকভাবে অসহায়। কাদের ঘরে সুন্দরী নারী রয়েছে। এসব তথ্য তাদের অভিযানকে আরও নিষ্ঠুর ও লক্ষ্যভিত্তিক করে তোলে।

এইভাবে, চারদিকের ভৌগো লিক বিচ্ছিন্নতা, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, দখলদার বাহিনির ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং স্থানীয় দোসরদের সহযোগিতা মিলিয়ে কৃষ্ণপুর গ্রামের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন এক ভয়াল পরিবেশ তৈরি করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত সেই নির্মম গণহত্যার মঞ্চ প্রস্তুত করে দেয়।

গণহত্যা ও নির্যাতনের পটভূমি

হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জের সাথে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ছিল। শায়েস্তাগঞ্জ হচ্ছে বৃহত্তর সিলেটের প্রবেশদ্বার। শায়েস্তাগঞ্জের রেল ও সড়ক পথ দিয়ে পাক বাহিনি হবিগঞ্জে প্রবেশ করে এবং জেলাজুড়ে তান্ডব চালায়। লাখাই উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামও এই নির্মমতার বাইরে ছিল না। তবে কৃষ্ণপুরে আক্রমণ করা হয়েছিল কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম থেকে। অভিযোগ রয়েছে 'আমি আল বদর বলছি' ও 'দুই পলাশী দুই মীরজাফর' বইয়ের লেখক কেএম আমিনুল হক ওরফে রজব আলীর নেতৃত্বে রাজাকার আল বদরদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় কৃষ্ণপুরে বর্বর হামলা করা হয়।

বিশেষ করে হিন্দু অধ্যুষিত হওয়ায় গ্রামটি পাকিস্তানি বাহিনির বিশেষ টার্গেটে পরিণত হয়। সেই সময় পাকিস্তানি সেনারা হিন্দু সম্প্রদায়কে শত্রু মনে করে তাদের ওপর পরিকল্পিত নিপীড়ন চালাত, যা ছিল এক ধরনের জাতিগত ও ধর্মীয় নিধননীতি।

স্থানীয় রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনির সহযোগিতা এই নির্যাতনকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। তারা গ্রামবাসীদের পরিচয় শনাক্ত করে, বাড়িঘর চিহ্নিত করে এবং পাকিস্তানি সেনাদের কাছে তথ্য সরবরাহ করত। ফলে নিরপরাধ মানুষদের জন্য পালানোর বা আত্মরক্ষার সুযোগ প্রায় ছিল না।

সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক দমননীতি, ধর্মীয় বৈষম্য, স্থানীয় দোসরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভৌগোলিক দুর্বলতাড়এই সবকিছু মিলেই কৃষ্ণপুরে সংঘটিত গণহত্যা ও নির্যাতনের পটভূমি তৈরি করে। এর ফলশ্রুতিতেই এক

ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়, যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক বেদনাদায়ক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ছয়মাস কৃষ্ণপুরবাসী স্বাভাবিক জীবন যাপন করছিলেন। তাই নিরাপদ মনে করে অনেক হিন্দু শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এখানে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে হবিগঞ্জ জেলার সবচেয়ে বড় এবং হৃদয় বিদারক গণহত্যায় যোগ দিতে সৈন্যরা অষ্টগ্রাম থেকে দুটি স্পিডবোট ও দুটি বড় নৌকা(পাতাম নৌকা) ব্যবহার করে। হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে পৃথককারী বলভদ্র নদী পরিবেষ্টিত সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত কৃষ্ণপুরের গোকলনগর, গদাইনগর, চন্ডীপুর, লালচাঁনপুর ও গঙ্গানগরের ছোট ছোট পাড়া গ্রাম ঘেরাও করে শত্রুরা। প্রথমে স্পিডবোট দ্বারা চারপাশে চক্কর দিয়ে আতঙ্ক তৈরী করে। ছোট ছোট নৌকা দিয়ে কৃষ্ণপুরসহ আশপাশের এলাকা এমনভাবে তারা ঘেরাও করে যেন কেউ পালানোর সুযোগ না পায়। প্রতিটি বাড়ির বের হবার মুখে নৌকা নিয়ে অবস্থান নেয় পাকিস্তানি বাহিনি ও রাজাকাররা। গ্রাম্য মাতবর কালী দাস রায় ভোরে গিয়েছিলেন কৃষ্ণপুর চকবাজারে। ঘাতকদের দেখে কৃষ্ণপুরবাসীকে বাঁচাতে দৌড়ে তিনি গ্রামে গিয়ে 'পালাও পালাও' বলে চিৎকার করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকেও প্রাণ দিতে হয় নির্মমভাবে। হানাদার বাহিনির উপস্থিতি টের পেয়ে প্রাণ ভয়ে কেউ কেউ পুকুর-ডুবার কচুরিপানা ও জমির ধান ক্ষেতে আশ্রয় নেন। হানাদার বাহিনির সদস্য ও তাদের দোসররা প্রথমে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে। পরে ছোট ছোট কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাসী চালিয়ে নিরীহ নিরপরাধ নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশুসহ প্রায় দেড়শো জনকে ধরে পৃথক পৃথক স্থানে হত্যা করে খুনীরা।

কৃষ্ণপুর গ্রামের গকুলনগর পাড়ায় যদু নন্দন রায়ের পূজা বাড়ি (দুর্গাবাড়ি)তে ঘটে সবচেয়ে বড় হত্যাকান্ডটি। দুর্গামন্দিরের পাশে বাড়ির পুকুর ঘাটলা সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে বামাচরণ রায়, রাধিকা মোহন রায়, শব রঞ্জন রায়, কিশোরী মোহন রায়, অনিল মাঝি, ব্রজেন্দ্র রায়, হরিদান রায়, ক্ষীতিস গোপ, নীতিশ গোপ, হীরালাল গোপ, সুভাষ সূত্রধর, যোগেন্দ্র সূত্রধর, প্রমোদ দাস, সুদর্শণ দাশ, গোপাল রায়, দীগেন্দ্র আচার্য, দীনেশ বিশ্বাস, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, ননী চক্রবর্তী, সুনীল চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ দাশ, ধীরেন্দ্র রায়, হরিচরণ রায়সহ অন্তত ২৫/৩০জনকে।

সেখানে লাশ ২/৩দিন পরে ছিল। অর্ধগলিত লাশ পরে নদীতে ভাসিয়ে দেন স্বজনরা। ননী গোপাল রায়ের মা সোনামনি রায়, স্ত্রী সুখী রাণী রায়, আত্নীয় যুথী রাণী রায় কাজের লোক প্রহলাদ নমশূদ্র সৎকার, লাশ পানিতে ভাসানো ও আহতদের সেবায় ভূমিকা রাখেন।

কৃষ্ণপুরের চন্ডীপুর পাড়ায় হানা দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনি গ্রামের সব পুরুষকে জড়ো করে এক জায়গায়। লাইনে দাঁড় করিয়ে সবাইক হত্যা করায় গ্রামটি পুরুষশূন্য হয়ে যায়। এখন এ গ্রামের অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে মানচিত্র থেকে। ইতিহাস থেকে চিরতরে মুছে গেছে চন্ডীপুরের নাম। চন্ডীপুরে জয় কুমার রায়, চন্দ্র কুমার রায়, মদন রায়, শান্ত রায়, দাসু শুক্ল বৈদ্যসহ অন্তত ১৫জন শহিদ হন। এর মধ্যে জয় কুমার ও চন্দ্র কুমার আপন দুই ভাই। মদন রায় তাদের ভাতিজা, শান্ত রায় তাদের ভাগিনা। চন্দ্র কুমার রায়ের বাড়ির একটি ঘরে ১০/১২জন নারীকে জড়ো করে স্বর্ণালংকার লুট করে প্রথমে পরে তাদেরকে ধর্ষণ করে পালাক্রমে পাক নারী লোভীরা। কৃষ্ণপুরের লালচাঁন্দপুর পাড়ায় লালচাঁনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশে পুকুর পাড়ে ১৫/১৬জনকে জড়ো করে একই কায়দায় লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে জিগাংসা মিটায় পাকিস্তান সেনারা। এখানে লুটপাটের পর হত্যার নেশায় মেতে উঠে সেনারা। ডা. ননী গোপাল রায়, গোপী মোহন সূত্রধর, মহেন্দ্র রায়, সুনীল রায়, কালীদাস রায়, মুকুন্দ সূত্রধর, যুগেন্দ্র সূত্রধর প্রমুখ প্রাণ হারান লালচাঁনপুরে।

কৃষ্ণপুরের গদাইনগর পাড়ার চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়ির উঠানে অন্তত ১৫জনকে জড়ো করে হাত-পা বেঁধে ফেলে পাক বর্বর বাহিনি। পরে গুলি করে নির্দয়ভাবে হত্যা করে তাদেরকে। ব্রজেন্দ্র লাল রায়, বামাচরণ রায়, শুকদেব দাসসহ গদাইনগরে শ্বশুর বাড়িতে নিহত হন আজমিরীগঞ্জের বদলপুর চেয়ারম্যান বোধাই সরকারের ছেলে ঈশান চন্দ্র দাশ। গদাইনগরেও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। কৃষ্ণনগর লাগোয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাছিরনগর উপজেলার গঙ্গানগরেও হামলা চালায় জল্লাদেরা। শিরিস আচার্যসহ গঙ্গানগরে ১০জন নিরীহ মানুষকে হত্যার পর পাকিস্তানি বাহিনির গুলি শেষ হয়ে যায়। তাই আরো ১০জনকে ধরে নিয়ে দা দিয়ে কুপিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

উল্লিখিত স্থান ছাড়াও গ্রামের এখানে ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে পড়েছিল অনেক মরদেহ। এ নির্মম নারকীয় এ গণহত্যায় প্রায় ১৫০ জন শহিদ হলেও নাম পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র ৪৫জনের। পাকিস্তানি সেনারা ভোর ৫টা থেকে শুরু

করে দিনভর এখানে হত্যা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। বিকেল ৫টার দিকে খুনীচক্র চলে যাবার পর যারা বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিল তারা আস্তে আস্তে গ্রামে ফিরে আসে। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় লাশের স্তুপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান তারা। কয়েকটি লাশ স্থানীয় শ্মশানে দাহ করে। কিছু লাশ বলভদ্র নদীতে ভেসে যায়। বাকিগুলো পানিতে পড়ে থাকে। ১৯ সেপ্টেম্বর ছিল মহালয়া। নিরাপত্তার কারণে ও মহালয়া উপলক্ষে জড়ো হওয়া লোকদের অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে হানাদার বাহিনি নৃশংসভাবে হত্যা করে। এর মধ্যে ৪৫জন ছিলেন কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। বাকি শহিদ বহিরাগত হবার কারণে তাদের নাম পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। সেই বিভীষিকায় শতাধিক নারী-পুরুষ আহত হয়েছিলেন। প্রিয় তোষ রায় মঞ্জু, প্রমোদ রায় ওরফে কামিনী রায়, দয়াল দাশ, বন বিহারী রায়,নবদ্বীপ রায় ও হরিদাস রায় বুলেটের আঘাতে জর্জরিত হয়েও বেঁচে যান। তবে বিকলাঙ্গ হয়ে যান সারা জীবনের জন্য। ভূষণ সূত্রধরের কাছ থেকে ১১ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এক ক্যাপ্টেন। তাঁকে লাইনে দাঁড় করানোর সময় সবার পেছনে দাঁড় করায়। তাঁর শরীরে গুলি না লাগায় এক পাকিস্তানি সৈন্য বলে উঠে ‘পিছমে এক বদমে রহেগা’ তখন টাকা নেওয়া ক্যাপ্টেন বলে ‘দুসরা মাত নেহিগা চল যায়েগা’। এভাবেই বেঁচে যান ভূষণ সূত্রধর।

পরিচয় পাওয়া হতভাগ্য নিহতরা হলেন-ডা. ননী রায়, রাধিকা মোহন রায়, মহেন্দ্র রায়, চন্দ্র কুমার রায়, জয় কুমার রায়, শান্ত রায়, সখী চরণ রায়, কিশোরী রায়,বজেন্দ্র রায়, ধীরেন্দ্র রায়, হরিচরণ রায়, মদন রায়, হরিদাস রায়,হরসূন্য রায়, ডা. অবিনাশ রায়, বামা চরণ রায়, শৈলেশ রায়, গোপাল রায়, রেবতি রায়, শবরঞ্জন রায়, সুনীল শর্মা, অনিল মাঝি, ননী চক্রবর্তী, সুনীল চক্রবর্তী, জগদীশ দাস, ঈশান দাস, শুকদেব দাস, প্যারী দাস, প্রমোদ দাস, সুদর্শন দাস, রসরাজ দাস, জয় গবীন্দ দাস, বিশ্বনাথ দাস, মহাদেব দাস, মহেশ দাস, গোপী মোহন সূত্রধর, মুকুন্দ সূত্রধর, গোপাল সূত্রধর, যোগেন্দ্র সূত্যধর, প্রকাশ সূত্রধর, সুভাস সূত্রধর, দীনেশ বিশ্বাস, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, ক্ষিতীশ গোপ, হিরা লাল গোপ, দাসু শুক্ল বৈদ্য, দিগেন্দ্র আচার্য। নিহতদের লাশগুলো ভেসে ভেসে চন্ডীপুরের পাশে একটি স্থানে জমা হয়েছিল। অনেক কঙ্কাল ছিল সেখানে। ঐ স্থানেই পরবর্তীতে একটি বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত হয় । সেখানে একটি দৃষ্টিনন্দন স্মৃতিস্মারক তৈরী করা হয়েছে।

২০১০ সালের ৪ মার্চ গণহত্যায় বেঁচে যাওয়া হরিদাস রায় বাদী হয়ে 'আমি আল বদর বলছি' ও 'দুই পলাশী দুই মীরজাফর' বইর লেখক আমিনুল ইসলাম ওরফে রজব আলী, রাজাকার লিয়াকত আলী ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ১১ আগস্ট ২০১০ কৃষ্ণপুর গণহত্যা, মানবতা বিরোধী অপরাধের প্রথম মামলা হিসেবে সিলেট বিভাগ থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল দ্বারা গৃহীত হয়। ২০২২ সালের ২ জুলাই ঢাকায় গ্রেফতার করা হয় যুদ্ধাপরাধ মামলায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী রজব আলীকে।

গণহত্যা ও নির্যাতনকারীদের পরিচয়

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কৃষ্ণপুর গ্রাম-এ সংঘটিত গণহত্যা ও নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত প্রধান শক্তি ছিল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনি এবং তাদের সহযোগী স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীসমূহ। এই নির্যাতনকারীদের পরিচয় বিশ্লেষণ করলে একটি সুসংগঠিত ও বহুমাত্রিক দমন কাঠামোর চিত্র স্পষ্ট হয়।

গণহত্যার মূল পরিকল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারী ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনি। অপারেশন সার্চলাইট-এর পর তারা সারা দেশে যে দমননীতি চালায়, তার অংশ হিসেবেই কৃষ্ণপুরে অভিযান পরিচালিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের দমন করা এবং বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে নির্মূল বা বিতাড়িত করা। পাকিস্তানি বাহিনিকে সরাসরি সহায়তা প্রদানকারী স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রাজাকার বাহিনি অন্যতম ছিল। তারা গ্রামাঞ্চলে অবস্থান করে স্থানীয় মানুষদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বাড়িঘর চিহ্নিত করা এবং অভিযানের সময় পথনির্দেশনা দেওয়ার কাজ করত। কৃষ্ণপুরের ক্ষেত্রেও রাজাকারদের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের সনাক্ত করা সহজ হয়ে পড়ে।

আলবদর এবং আলশামস ছিল পাকিস্তানি বাহিনির সহযোগী আধাসামরিক সংগঠন, যারা বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী নিধন ও টার্গেটেড সহিংসতায় জড়িত ছিল। যদিও এদের কার্যক্রম শহরাঞ্চলে বেশি লক্ষ্য করা যায়, তবুও গ্রামীণ এলাকাতেও তারা বিভিন্ন নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ রয়েছে। কৃষ্ণপুরে তারা শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. অবিনাশ চন্দ্র রায়কেও তারা হত্যা করে। গণহত্যার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল কিছু স্থানীয় ব্যক্তির সম্পৃক্ততা, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ, রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ভয়ের কারণে পাকিস্তানি বাহিনিকে সহায়তা করেছিল। তারা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের

প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে তথ্য প্রদান করে, যার ফলে নিরপরাধ মানুষ সহজেই টার্গেটে পরিণত হয়।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার এই ধরনের অপরাধের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। কৃষ্ণপুরের গণহত্যার ঘটনায় রজব আলী, লিয়াকত আলী, মওলানা শফিউদ্দিন, তাজুল ইসলাম, জাহেদ মিয়া, ছালেক মিয়া প্রমুখের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল।

শহিদ সনাক্তকরণ

কৃষ্ণপুর গণহত্যা বাংলাদেশের স্থানীয় ইতিহাসের এক মর্মান্তিক অধ্যায়। এই হত্যাযজ্ঞে নিহত অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের পরিচয় নির্ধারণ বা শহিদ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল গবেষণার ক্ষেত্র।

গণহত্যার সময়কার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও আতঙ্কপূর্ণ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি ও তাদের এদেশীয় দোসরদের আকস্মিক আক্রমণের ফলে অনেক মানুষকে দ্রুত হত্যা করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃতদেহ তাৎক্ষণিকভাবে দাফন বা লুকিয়ে ফেলা হয়। ফলে নিহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা তখন সম্ভব হয়নি। তবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় এবং লিখিত নথির অভাবে অনেক শহীদের নাম-পরিচয় আজও অজানা রয়ে গেছে। অনেক পরিবার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় তাদের পরিচয় শনাক্ত করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে কৃষ্ণপুর গণহত্যার শহিদদের একটি বড় অংশ আজও "নাম-না-জানা শহিদ" হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত।

নির্যাতিত ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মৌখিক ভাষ্য

বীর মুক্তিযোদ্ধা অমরেন্দ্র লাল রায় ওরফে দারোগা বাবু (৭৬)

পিতা: ননী গোপাল রায়, গ্রাম: কৃষ্ণপুর, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কৃষ্ণপুর কমলাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়, কৃষ্ণপুর, লাখাই, ৫ আগস্ট ২০২২

সেই দিন ১৮ সেপ্টেম্বর, ২ আশ্বিন। মহালয়ার দিন। ভোর থেকেই গ্রামে অস্বাভাবিক নীরবতা ছিল। হঠাৎ দেখি চারদিক থেকে সেনারা ও তাদের সহযোগীরা গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। স্পিড বোর্ড চক্কর দিয়ে মারাত্মক আতঙ্ক তৈরি

করে। তারপর মাঝিদের ছোট ছোট নৌকা বাড়ির ঘাটে ঘাটে পাহারা বসায়। যাতে কেউ পালাতে না পারে। কেউ ঘর থেকে বের হতে পারছিল না। আমরা শুধু কান্না আর চিৎকার শুনছিলাম। ১৯৭১ সালের সেই বিভীষিকাময় দিনটির কথা মনে পড়লেই আজও বুক কেঁপে ওঠে। সকাল থেকেই গ্রামে এক ধরনের অজানা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি ও তাদের এদেশীয় দোসররা গ্রামে প্রবেশ করে এবং কোনো প্রকার সতর্কতা ছাড়াই নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যেই শান্ত গ্রামটি মৃত্যুপরীতে পরিণত হয়। মানুষ দিকবিদিক ছুটতে থাকে। কেউ সন্তানকে কোলে নিয়ে পালাচ্ছে, কেউ আবার বৃদ্ধ বাবা-মাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। আমার চোখের সামনে বহু নিরীহ মানুষকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখি। চারদিকে শুধু গুলির শব্দ, আগুনের লেলিহান শিখা আর মানুষের আর্তচিৎকার। সব মিলিয়ে এক নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমি প্রাণ বাঁচানোর জন্য পাশের ঝোপে লুকিয়ে ছিলাম এবং সেখান থেকেই এই ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। যাদের ভাগ্য ভালো তারা পুকুরে কচুরিপনার নিচে আশ্রয় নিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে। আজও সেই দিনের স্মৃতি আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। কৃষ্ণপুরের এই গণহত্যা আমাদের জীবনের এক অবিস্মরণীয় কালো অধ্যায় হয়ে আছে।

প্রদীপ চন্দ্র রায় (৭০)

পিতা: শহিদ ডা. অবিনাশ চন্দ্র রায়, গ্রাম: কৃষ্ণপুর, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কৃষ্ণপুর কমলাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়, কৃষ্ণপুর, লাখাই, ৫ আগস্ট ২০২২

আমি ছোট ছিলাম, তাই আমাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। জানালা দিয়ে দেখেছি মানুষদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হচ্ছে। এরপর গুলির শব্দ শুনি। গ্রামের বিভিন্ন দিক থেকে ধোঁয়া আর আর্তচিৎকার ভেসে আসছিল। সেই দৃশ্য আমি আজও

ভুলতে পারি না। সেই দিনের প্রতিটি মুহূর্ত আজও আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট। হঠাৎ করেই চারদিকে গুলির শব্দ শোনা যায় এবং মানুষ দৌড়াতে শুরু করে। আমাদের ঘরের পাশেই আগুন লাগানো হয়, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। চারদিকে শুধু ধোঁয়া আর আতঙ্ক। কেউ দ্রুত পুকুরে কচুরিপনার নিচে লুকিয়ে থাকে। আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন সেদিন বাঁচতে পারেননি। সেই দিনের ভয়াবহতা আমাদের শৈশব কেড়ে নিয়েছে। আজও সেই স্মৃতি মনে পড়লে মনে হয় যেন আবার সেই সময়টায় ফিরে গেছি। এই গণহত্যা আমাদের প্রজন্মের মনে চিরস্থায়ী দাগ রেখে গেছে। আমার বাবাসহ অনেক স্বজন হারিয়েছি সেদিন।

লিটন সূত্রধর (৬৫)

পিতা: ভূষণ সূত্রধর, গ্রাম: কৃষ্ণপুর, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কৃষ্ণপুর কমলাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়, কৃষ্ণপুর, লাখাই, ৫ আগস্ট ২০২২

আমার বাবাকে হত্যার জন্য লাইনে নিয়ে যায়। আমরা কিছুই করতে পারিনি। বাবা ছিলেন লাইনের শেষ দিকে। তার কাছে ১১ হাজার টাকা ছিল। পাকিস্তানি একজন ক্যাপ্টেন টাকাটা নিয়ে যায়। বাবাকে গুলি না করায় একজন পাকিস্তানি সেনা বলে ওঠে ‘পিছমে এক বদমে রহেগা’ তখন টাকা নেওয়া ক্যাপ্টেন বলে ‘দুসরা মাত নেহিগা চল যায়েগা’। এভাবেই বেঁচে যান আমার বাবা। সেদিনের ঘটনাগুলো আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ স্মৃতি। ভয়ে নারী ও শিশু ঘরের ভেতরে আতঙ্কে জড়োসড়ো লুকিয়ে ছিল। হঠাৎ করেই দরজা ভেঙে হানাদার বাহিনির সদস্যরা ঘরে ঢুকে পড়ে। তারা কোনো কথা না শুনেই তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে শুরু করে। আমার বাবা ও ভাইকে তারা টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায় এবং নির্মমভাবে প্রহার করে।

আমি অসহায়ের মতো সবকিছু দেখেছি, কিছুই করতে পারিনি। সেই সময়ের ভয়, লজ্জা ও কষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আজও সেই স্মৃতি মনে পড়লে বুক ফেটে কান্না আসে।

বাবলু রায় (৬৬)

পিতা: শহিদ কালীদাস রায়, গ্রাম: কৃষ্ণপুর, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কৃষ্ণপুর কমলাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়, কৃষ্ণপুর, লাখাই, ৫ আগস্ট ২০২২

আমার বাবা কালী দাস ছিলেন গ্রাম্য মাতব্বর। তিনি ভোরে স্থানীয় বাজারে গিয়েছিলেন। তখনো গ্রামের বেশির ভাগ লোক ঘুমেই ছিল। দৌড়ে এসে গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজেই পাক বাহিনির হাতে নির্মমবাবে নিহত হন। সেদিন পুরো গ্রাম লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে বসতঘরগুলো ছাড়খার করে দেওয়া হয়। কোলের শিশুদের মায়ের সামনে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। গ্রামের স্থানে স্থানে মানুষের লাশ পড়ে ছিল ৩/৪ দিন। অর্ধগলিত লাশ স্বজনরা পানিতে বাসিয়ে দেন। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ঘটেছিল ২৮ সেপ্টেম্বর। হানাদার বাহিনি আমাদের গ্রামে হঠাৎ আক্রমণ করে এবং আমার বাবাসহ স্বজনদের হারিয়েছি সেদিন। আমরা তখন কিছুই করতে পারিনি শুধু অসহায়ের মতো তাদের নিয়ে যেতে দেখেছি। পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাদের নিথর দেহ খুঁজে পাই গ্রামের এক পাশে।

গোপেন্দ্র লাল রায় (৭৩)

পিতা: ননী গোপাল রায়, গ্রাম: কৃষ্ণপুর, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কৃষ্ণপুর কমলাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়, কৃষ্ণপুর, লাখাই, ৫ আগস্ট ২০২২

নারীদের আলাদা করে রাখা হয়েছিল। আমরা দূর থেকে শুধু কান্নার শব্দ শুনছিলাম। কাউকে সাহায্য করতে পারিনি। সেই ভয়াবহ দৃশ্যের পর অনেক নারী গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, কেউ আর ফিরতে পারেনি আগের জীবনে। আমরা ভয় পেয়ে কেউ সামনে যেতে সাহস পাইনি। পুরো গ্রাম যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। সেই সময়ের আতঙ্ক, অসহায়তা এবং মানবিক বিপর্যয়ের চিত্র যারা দেখেছে তারা ছাড়া কেউ প্রকৃত ঘটনা

বুঝবে না। কৃষ্ণপুরের গণহত্যা আমাদের জীবনের এক ভয়ঙ্কর অধ্যায়। ১৮ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণপুরের কালো অধ্যায়। সেদিন হানাদার বাহিনি শুধু মানুষ হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং যা কিছু ছিল সব লুটপাট করে নিয়ে যায়। নিহত ও আহত আহত অবস্থায় সে দিন শত শত মানুষ নির্মমতার শিকার হয়েছিল। সেই দিনটির পর থেকে আমাদের জীবন আর স্বাভাবিক থাকেনি। আমরা সবকিছু হারিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে বাধ্য হই। স্বাধীনতার এত বছর পরও সেই স্মৃতি ভুলে থাকা সম্ভব হয়নি।

স্মৃতি সংরক্ষণের প্রয়াস

কৃষ্ণপুর গণহত্যা একটি স্থানীয় ঘটনা হলেও গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই নির্মম ঘটনার স্মৃতি সংরক্ষণ এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

২০১২ সালের ১৭ ডিসেম্বর কৃষ্ণপুরে শহিদদের স্মরণে বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

প্রথমদিকে, গণহত্যার পরবর্তী সময়ে গ্রামটি ছিল শোক, আতঙ্ক ও নিস্তব্ধতার মধ্যে আচ্ছন্ন। বহু পরিবার হারিয়ে যাওয়ায় এবং সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সংগঠিত স্মৃতি সংরক্ষণ উদ্যোগ গড়ে ওঠেনি। তবে সময়ের সাথে সাথে বেঁচে থাকা প্রত্যক্ষদর্শী, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি এবং

শহিদ পরিবারের সদস্যরা মৌখিকভাবে ঘটনার স্মৃতি ধরে রাখেন। এই মৌখিক ইতিহাসই পরবর্তীতে স্মৃতি সংরক্ষণের প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে। পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে গণহত্যার স্থানগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা শুরু হয়।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষক ও লেখকরা কৃষ্ণপুর গণহত্যা নিয়ে প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং গবেষণাধর্মী রচনা প্রকাশ করেছেন। এতে ঘটনাটির ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে শহিদদের নাম সংরক্ষণ ও তালিকা তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে, যদিও তা এখনো সম্পূর্ণ নয়। হবিগঞ্জের একটি বড় গণহত্যা হচ্ছে কৃষ্ণপুর গণহত্যা। ২০০৯ সালে গ্রামবাসীর উদ্যোগে কমলায়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।

কৃষ্ণপুর বধ্যভূমি, লাখাই

২০২০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর এটি উদ্বোধন করা হয়। এ স্মৃতিস্তম্ভে ৪৫ জন শহিদের নাম রয়েছে। এই স্মৃতিস্তম্ভের গেইটের উপরে দুই পাশে দুইজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি রয়েছে। মূল স্মৃতিস্তম্ভের এক পাশে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণরত অবস্থার প্রতিকৃতি, অন্যপাশে রয়েছে একজন নারী মুক্তিযোদ্ধাসহ তিনজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার ছবি। মাঝে একটি উঁচু স্তম্ভের উপরে রয়েছে বৃত্তাকার লাল আকৃতির সূর্য। একাত্তরে বর্ষার পানির স্রোতে এবং

ঢেউয়ে অনেক লাশ ভেসে চণ্ডীপুর গ্রামের পার্শ্বে আসায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও পুলিশ পরিদর্শক অমরেন্দ্র লাল রায় গ্রামের সকলকে নিয়ে বধ্যভূমি নির্মাণের জন্য এই স্থানটি নির্ধারণ করেন। এ জন্য সরকার তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়। কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা শিক্ষা বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী প্রদীপ কান্তি রায় বধ্যভূমি নির্মাণের নকশা প্রনয়ণ করেন।

কৃষ্ণপুর গ্রামের সন্তান সরকারি গেজেটভুক্ত শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. অবিনাশ চন্দ্র রায়ের উঠানের এক কোনায় পারিবারিক উদ্যোগে একটি স্মৃতিফলক তৈরি করা হয় ২০১০ সালে।

ডা. অবিনাশ চন্দ্র রায় স্মৃতিসৌধ

কৃষ্ণপুর, লাখাই গণহত্যায় শহিদদের নামফলক

মূল্যায়ন

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণপুরের গণহত্যা ও নির্যাতন একটি গভীর মানবিক বিপর্যয় হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। এই ঘটনা কেবল একটি স্থানীয় সহিংসতা নয়; বরং এটি ছিল পরিকল্পিত দমননীতি, জাতিগত নিধনপ্রবণতা এবং যুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

ঘটনার সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি ও তাদের সহযোগী স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর সমন্বিত কার্যক্রমের ফলে নিরপরাধ জনগোষ্ঠী

লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। বিশেষ করে হিন্দু অধ্যুষিত কৃষ্ণপুর গ্রামে এই সহিংসতা আরও তীব্র আকার ধারণ করে, যা সেই সময়ের সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন।

ভৌগোলিকভাবে গ্রামটির অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং আশপাশের নির্জন পরিবেশ—সব মিলিয়ে এটি এক ধরনের "অরক্ষিত অঞ্চল"-এ পরিণত হয়েছিল। এই সুযোগকে ব্যবহার করে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়, যেখানে প্রায় ১৫০জন নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারান বলে স্থানীয় বর্ণনায় উঠে এসেছে। এই বিপুল প্রাণহানি শুধু সংখ্যাগত ক্ষতি নয়, বরং একটি সামাজিক কাঠামোর ভাঙনের প্রতিচ্ছবি। পঙ্গু ও আহত হন অনেকে। মারাত্মক আহত হন প্রিয়তুষ রায় মঞ্জু, কামিনী রায়, দয়াল দাশ, বন বিহারী রায় প্রমুখ।

এই গণহত্যা ছিল পরিকল্পিত সামরিক দমননীতির অংশ, যেখানে স্থানীয় সহযোগীদের ভূমিকা ঘটনাটিকে আরও জটিল ও ভয়াবহ করে তোলে। এর ফলে ঘটনাটি কেবল বাহ্যিক আক্রমণ নয়, বরং অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার দিকও বহন করে।

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনা গভীর শোক ও ট্রমার জন্ম দেয়। বহু পরিবার সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এবং বেঁচে থাকা মানুষদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী মানসিক ও সামাজিক ক্ষত সৃষ্টি হয়। এই প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মেও প্রতিফলিত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই ঘটনার ইতিহাস এখনো অনেকাংশে মৌখিক স্মৃতির ওপর নির্ভরশীল। লিখিত নথির সীমাবদ্ধতা, সময়ের ব্যবধান এবং তথ্যসংগ্রহের ঘাটতির কারণে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনো গড়ে ওঠেনি। এ কারণে কৃষ্ণপুর গণহত্যা গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অসম্পূর্ণ অধ্যায় হিসেবে রয়ে গেছে।

সামগ্রিকভাবে কৃষ্ণপুর গণহত্যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসে একটি বেদনাবিধুর ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি শুধু অতীতের একটি ঘটনা নয়, বরং মানবাধিকারের গুরুত্ব, যুদ্ধাপরাধের বাস্তবতা এবং ইতিহাস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার একটি শক্তিশালী অনুস্মারক। যথাযথ গবেষণা, দলিল সংরক্ষণ এবং স্মৃতিচর্চার মাধ্যমে এই ঘটনার প্রকৃত মূল্যায়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

গ্রন্থ ও সংকলন

তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটে গণহত্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১০০০, ২০১৩

তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটের যুদ্ধকথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১০০০, ১৯৯৯

সঞ্জয় কান্তি দেব, *বিস্মৃতির আড়ালে সিলেটের গণহত্যা*, উদয়ন অফসেট প্রেস, সিলেট, ২০১৪

শেখ ফজলে এলাহী, *মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ জেলা*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা ১১০০, ২০১৫

মুহম্মদ সায়েদুর রহমান তালুকদার, *মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জের ইতিহাস*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা ২০১১

রোমা মোদক, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস হবিগঞ্জ জেলা*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০১৭

মফিদুল হক, *বাংলাদেশে গণহত্যা ও ন্যায়রথের যাত্রা*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা ২০১৬

মাহফুজুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯

কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস সিলেট*, বাংলা একাডেমি, ২০১৮

তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল ও তরফদার মুহাম্মদ ইফতেখার, *স্বাধীনতা যুদ্ধে হবিগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা*, শব্দকথা প্রকাশন, ২০২২

সম্পাদিত গ্রন্থ

মুনতাসীর মামুন(সম্পা.) *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বিতীয় খন্ড, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

হারুন-অর-রশিদ (সম্পা.), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০২০

হবিগঞ্জ জেলার পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরগাথা, জেলা পুলিশ, হবিগঞ্জ, ১২জুলাই ২০২০

স্মরণিকা

এড. সালেহ আহমদ (সম্পা.) *একনজরে স্থাপনাসহ মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ জেলা* বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা ইউনিট কমান্ড, হবিগঞ্জ, ১৫ আগস্ট ২০১৬

শাহ মনসুর আহমদ সেলিম (সম্পা.), *তরফজ্যোতি ৫*, তরফ সাহিত্য পরিষদ, ২০২০

পত্র-পত্রিকা

দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০

প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১

সাক্ষাৎকার

বীর মুক্তিযোদ্ধা কেশব চন্দ্র রায় (৭০), পিতা : কুমুদ বন্ধু রায়, উপাধি : অব. কর্পো. ইস্ট বেঙ্গল, গ্রাম : ধর্মপুর। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : উপজেলা পরিষদ ভবন, লাখাই, ১৪ জুলাই ২০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মুর্শেদ কামাল চৌধুরী (৭০), পিতা : আব্দুল হেলিম চৌধুরী, গ্রাম : মুড়িয়াউক। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : বুল্লা বাজার, লাখাই, ১৪ জুলাই ২০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা সালেহ উদ্দিন আহমেদ (৬৫), পিতাঃ দৌলত মিয়া, পেশাঃ আইনজীবি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ বুল্লা বাজার, লাখাই, ১৪ জুলাই ২০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মো. তাজুল ইসলাম মাস্টার (৬৯), পিতাঃ লাল মিয়া, পেশাঃ অব. শিক্ষক, গ্রামঃ ধর্মপুর, বর্তমানঃ বুল্লা বাজার, লাখাই, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ ফারুক মিয়ার চায়ের দোকান, চেয়ারম্যান গলি, বামৈ বড় বাজার, লাখাই, ১৪ জুলাই ২০২২

আব্দুল ওয়াদুদ (৬৯), পিতাঃ ইউসুফ আলী, পেশাঃ মেম্বার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের স্বাক্ষী, গ্রামঃ মানপুর, ইউনিয়নঃ মুড়াকরি, উপজেলাঃ লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ ফারুক মিয়ার চায়ের দোকান, চেয়ারম্যান গলি, বামৈ বড় বাজার, ১৪ জুলাই ২০২২

এমদাদুল হক চৌধুরী (৭৬), পিতাঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী, পেশাঃ কৃষিকাজ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের স্বাক্ষী, গ্রামঃ জিরুন্ডা, উপজেলাঃ লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ ফারুক মিয়ার চায়ের দোকান, চেয়ারম্যান গলি, বামৈ বড় বাজার, ১৪ জুলাই ২০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা শামছুল হক (৬৮), পিতাঃ আব্দুল মন্নাফ, গ্রামঃ সাতাউক, উপজেলাঃ লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ ফারুক মিয়ার চায়ের দোকান, চেয়ারম্যান গলি, বামৈ বড় বাজার, লাখাই, ১৪ জুলাই ২০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী মো. শাহজাহান চিশতি (৬৫), পিতাঃ আব্দুল জব্বার উরফে আবু মিয়া, গ্রামঃ মুড়িয়াউক, উপজেলাঃ লাখাই, ১৪ জুলাই ২০২২

গৌর মোহন দাস (৭২), পিতা : নীল মোহন দাস, পেশা : শ্রমিক, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : বলভদ্র নদী দিয়ে কৃষ্ণপুর যাবার পথে নৌকায় , লাখাই, ৫ আগস্ট, ২০২২

গোপেন্দ্র লাল রায় (৭১), পিতা : ননী গোপাল রায়, পেশা : অব.সরকারি চাকরিজীবী, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : কৃষ্ণপুর কমলাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়, কৃষ্ণপুর, লাখাই, ৫ আগস্ট ২০২২

গোপেন্দ্র চন্দ্র রায় (৬০), পিতা : গোপাল চন্দ্র রায়, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : চন্ডীপুর, কৃষ্ণপুর কমলাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়, কৃষ্ণপুর, লাখাই, ৫ আগস্ট ২০২২

অতুল প্রসাদ রায় (৫৩), পিতাঃ শহিদ কালী দাস রায়, পেশাঃ ইউপি সদস্য, গ্রামঃ কৃষ্ণপুর, উপজেলাঃ লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : কৃষ্ণপুর কমলাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়, কৃষ্ণপুর, লাখাই, ৫ আগস্ট, ২০২২

আকবর হোসেন স্বপন (৬৫), পিতাঃ আরজু মিয়া, গ্রাম : পূর্ব বুল্লা, উপজেলাঃ লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ বুল্লা বাজার, লাখাই, ৪ অক্টোবর ২০২২

সৈয়দ সাদিক হোসাইন (৭০), সৈয়দ আকিকুল হোসাইন, পেশাঃ শিক্ষকতা, গ্রামঃ কাটিহারা, বামৈ, উপজেলাঃ লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ বামৈ ইউনিয়ন পরিষদ, লাখাই, ৪ অক্টোবর ২০২২

সুন্দর আলম (৭৫), পিতাঃ রহম আলী, গ্রামঃ ভাদিকারা, উপজেলাঃ লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ কালাউক বাজার, লাখাই, ৪ অক্টোবর ২০২২

খা মো. ফজলুল হক (৮০), পিতাঃ আব্দুল জব্বার খা, গ্রামঃ মানপুর, উপজেলাঃ লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ বামৈ ইউনিয়ন পরিষদ, ৪ অক্টোবর ২০২২

মো.আব্দুল হান্নান(৬৫), পিতা : ইউসুফ আলী, গ্রাম : মানপুর, উপজেলা : লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : বামৈ ইউনিয়ন পরিষদ, ৪ অক্টোবর, ২০২২

মো.কবির মিয়া(৬২), পিতা : কটু মিয়া, মাতা : বীর মুক্তিযোদ্ধা আবেদা খাতুন, গ্রাম : কাটিহারা, ইউনিয়ন : বামৈ,উপজেলা : লাখাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : জহুর চান বিবি মহিলা কলেজ, শায়েস্তাগঞ্জ, ৯ নভেম্বর ২০২২

পরিশিষ্ট-১

কৃষ্ণপুর গণহত্যায় শহিদদদের নামের অসমাপ্ত তালিকা

১. ডা. ননী রায় (৫০), পিতা : বিনোদ বিহারী রায়, পেশা : চিকিৎসা, গ্রাম : কৃষ্ণপুর ,উপজেলা : লাখাই।
২. রাধিকা মোহন রায় (২৩), পিতা : হরেন্দ্র রায়, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।
৩. গোপী মোহন সূত্রধর (২১), পিতা : বিহারী লাল সূত্রধর, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।
৪. মুকুন্দ সূত্রধর (৬৫), পিতা গোপাল সূত্রধর, পেশা : কাঠের ব্যবসা, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।

৫. যোগেন্দ্র সূত্রধর (৬২), পিতা : প্রকাশ সূত্রধর, পেশা : মিস্ত্রি, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।
৬. সুভাস সূত্রধর (৩৫), পিতা : নবদ্বীপ সূত্রধর, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গঙ্গানগর, উপজেলা : নাসিরনগর।
৭. মহেন্দ্র রায় (৬৫), পিতা : বিনোদ বিহারী রায়, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।
৮. চন্দ্র কুমার রায় (৬০), পিতা : অম্বিকা চরণ রায়,পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।
৯. জয়কুমার রায় (৫৫), পিতা : অম্বিকা চরণ রায়, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।
১০. শান্ত রায় (৫০), পিতা : সখী চরণ রায়, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।
১১. ব্রজেন্দ্র রায় (৬২), পিতা : অমর চাঁন রায়, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।
১২. ধীরেন্দ্র রায় (৫৫), পিতা : বৈষ্ণব রায়, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : বাঙ্গালপাড়া, উপজেলা : কিশোরগঞ্জ।
১৩. হরিচরণ রায় (৫৬), পিতা : ব্রজ গোপাল রায়, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : চন্ডীপুর, উপজেলা : লাখাই ।
১৪. মদন রায় (৩৫), পিতা : অন্নদা রায়, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : চন্ডীপুর, উপজেলা : লাখাই।
১৫. শবরঞ্জন রায় (১৫), পিতা : কৃষ্ণ কুমার রায়, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : গকুলনগর, উপজেলা : লাখাই।
১৬. বামাচরণ রায় (৩০), পিতা : রাজধন রায়, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।
১৭. ডা. অবিনাশ রায় (৬২), পিতা : অখিল রায়, পেশা : চিকিৎসা, গ্রাম : লালাচঁন্দপুর, কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার গোয়ালনগর গ্রামে ১৯০৯ সালের ২ জুলাই ডা. অবিনাশ চন্দ্র রায় জম্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম অখিল রায় এবং মাতার নাম সরস্বতী রায়। শৈশবকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে আত্মীয়তার যোগসূত্রে ভারতের আসাম চলে যান। সেখানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং আসাম মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে সেখানে সরকারি চাকুরিতেও

নিয়োগ প্রাপ্ত হন। কিছুদিন চাকুরি করে বাড়ীতে এলে এলাকার মানুষের সেবা করার মানষে তিনি আর আসাম সরকারি চাকুরিতে ফিরে না গিয়ে এলাকার থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মা-বাবার পছন্দ অনুযায়ী ১৯৩৩ সালে হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের যদু নন্দন রায়ের তৃতীয় কণ্যা বিনোদিনী রায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর মা-বাবার মৃত্যুর পর ১৯৪০ সাল থেকে তিনি কৃষ্ণপুর গ্রামে বাড়ী করে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। তখন অত্র এলাকায় ভাল কোন ডাক্তার না থাকায় তিনি ডাক্তারি পেশায় প্রভুত উন্নতি লাভ করেন। ডাক্তারি পেশাটি তিনি সম্পূর্ণ সেবার মনোভাব নিয়ে পেশাটিকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। কিছু দিনের মধ্যে পয়সা ছাড়া ডাক্তার হিসাবে গরীব মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের শোষণ অত্যাচার নির্যাতন এবং তখনকার পূর্ব পাকিস্তান জনগনের উপর বৈষম্য ও ষড়যন্ত্র প্রত্যক্ষ করে তিনি রাজনীতির সঙ্গে আস্তে আস্তে সক্রিয় হতে থাকেন। এমনিতেই তিনি এলাকার মানুষের কাছে জনপ্রিয় হওয়ায় মানুষ জন তার নিকট নিয়মিত আসা-যাওয়া করত বিধায় পাকিস্তানিরা যে এদেশের মানুষের সাথে বিমাতা সুলভ আচরণ করত তা নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য আহ্বান জানাতেন। তিনি হবিগঞ্জের তখনকার এমএনএ মোস্তফা আলীসহ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ৭০ সালের নির্বাচনে তিনি আওয়ামীলীগ প্রার্থী মোস্তফা আলী ও গোপালকৃষ্ণ মহারত্নের(এমপিএ) পক্ষে কাজ করেন। হবিগঞ্জে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির আন্দোলন, আইয়ূব খান বিরোধী আন্দোলনসহ সকল আন্দোলনে তিনি একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে এলাকার লোকজনকে নিয়ে বিভিন্ন সভা সমাবেশ করতেন।

১৯৬৯ এ গন আন্দোলনের সময় আরোও সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি পত্র পত্রিকা ও রেডিও মাধ্যমে সব সময় শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের নিদের্শনা অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মসূচি এলাকার জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে তৃর্ণমূল পর্যায়ে পালন করতেন ও নেতৃত্ব দিতে থাকেন। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও ভারতে না গিয়ে মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন । অনেক

আহত মুক্তিযোদ্ধা গোপনে তার চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতেন। এ খবর পার্শ্ববর্তী লাখাই উপজেলার পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্প ও এলাকার রাজাকার-আলবদর বাহিনির কাছে পৌছে যায়।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ লাখাই গ্রামের কয়েকজন লোক কান্নাকাটি করে একজন বয়স্ক রোগীকে চিকিৎসা করানোর কথা বলে বাড়ী থেকে নিয়ে যায়। পরিবার পরিজনের নিষেধ এবং বিপদ হতে পারে এই আশংকার কথা বলা সত্বেও "বৃদ্ধ হয়েছি মৃত্যু হবে রোগীর সেবা করাই ডাক্তারের ধর্ম" এই কথা বলে ঘর থেকে নিজস্ব নৌকায় দুপুর ১২ টায় বের হয়ে যান। তিনি রোগী দেখে ফিরে আসার সময় খবর পেয়ে স্থানীয় রাজাকার-আলবদর গণ রাস্তায় জিরুন্ডা গ্রামের কাছে গাছকান্দি নামক স্থানে তাকে আটকিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করার জন্য মারধর ও অমানুষিক নির্যাতন করে হাত পা বেধেঁ নদীর পানিতে ফেলে দেয়। নৌকার মাঝিরা মারধর খেয়ে ফিরে আসলে তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত জানা যায়। পরিবার পরিজন লাশের অনেক খোজঁখবর করলেও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। স্বাধীনতার পর কৃষ্ণপুর গ্রামের ১২৭ জন শহিদদের স্মরণে যে বধ্যভূমি তৈরি করা হয়েছে সেখানে শহিদদের তালিকার যে নাম ফলক রয়েছে তাতে ২নং ক্রমিকে শহিদ ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র রায়ের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। কৃষ্ণপুর গ্রামে তার নিজের বাড়ীতেও শহিদ ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র রায়ের স্মরণে পারিবারিকভাবে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে । প্রতি বৎসর মৃত্যুর তারিখে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে পারিবারিক ভাবে দিবসটি স্মরণ করা হয়। তার তিন ছেলে ও চার মেয়ে।

১৮. শৈলেশ রায় (১৫), পিতা : সুনিল রায়, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : গকুলনগর, উপজেলা : লাখাই।

১৯. কালিদাস রায় (৫০), পিতা : ব্রজেন্দ্র রায়, পেশা : ব্যবসা [তিনি গ্রাম্য মাতব্বর ছিলেন], গ্রাম : গকুলনগর, উপজেলা : লাখাই।

২০. গোপাল রায় (৪৫), পিতা : কোল চন্দ্র রায়, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : গকুলনগর, উপজেলা : লাখাই।

২১. রেবতি মোহন রায় (৪৫), পিতা : অজ্ঞাত, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গকুলনগর, উপজেলা : লাখাই।

২২. ননী চক্রবর্তী (২৬), পিতা : নরেন্দ্র চক্রবর্তী, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : গোয়ালগনর, উপজেলা : নাসিরনগর।

২৩. সুনীল চক্রবর্তী (৪৫), পিতা : হরিচরণ চক্রবর্তী, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : কটিয়াদি, উপজেলা : কিশোরগঞ্জ সদর।

২৪. জগদীশ দাস (৩০), পিতা : অঘোর দাস, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গদাইনগর, উপজেলা : লাখাই।

২৫. মহেশ দাস (৪২), পিতা : দীননাথ দাস, পেশা : মৎস্যজীবি/জেলে, গ্রাম : গদাইনগর, উপজেলা : লাখাই।

২৬. ঈশান দাস (৫০), পিতা : বোদাই দাস, পেশা : জনপ্রতিনিধি [ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান],গ্রাম : কাটাখালী, উপজেলা : কিশোরগঞ্জ সদর।

২৭. প্যারী চাঁদ দাস (৫০), পিতা : ভরত দাস, পেশা : জেলে, গ্রাম : গদাইনগর, উপজেলা : লাখাই।

২৮. প্রমোদ দাস (৫২), পিতা : প্রফুল্ল দাস, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গঙ্গানগর, উপজেলা : নাসিরনগর।

২৯. সুদর্শন দাস (৩৫), পিতা : প্রফল্ল দাস, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গঙ্গানগর, উপজেলা : নাসিরনগর।

৩০. শুকদেব দাস (৪২), পিতা : কামদেব দাস, পেশা : জেলে, গ্রাম : গদাইনগর, উপজেলা : লাখাই।

৩১. রসরাজ দাস (২৬), পিতা : রামধর দাস, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গদাইনগর, কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।

৩২. জয়গোবিন্দ দাস (৫০), পিতা : রামধন দাস, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।

৩৩. বিশ্বনাাথ দাস (৪০), পিতা : ক্ষেত মোহন দাস, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : নওয়াগাঁও, উপজেলা : নাসিরনগর।

৩৪. মহাদেব দাস (৫০), পিতা : কেবল দাস, পেশা : জেলে, গ্রাম : গদাইনগর, কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।

৩৫. সুনীল শর্মা (১৫),পিতা : সুসেন শর্মা, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।

৩৬. দাশু শুক্লবৈদ্য (৩০), পিতা : কৃষ্ণচরণ শুক্ল বৈদ্য, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : চন্ডীপুর কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।

৩৭. নিতীশ গোপ (৩৫), পিতা : গঙ্গাচরণ গোপ, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গঙ্গানগর, উপজেলা : নাসিরনগর।

৩৮. ক্ষিতিশ গোপ (২২), পিতা : গঙ্গাচরণ গোপ, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গঙ্গানগর, উপজেলা : নানিরনগর।

৩৯. হীরালাল গোপ (৩৫), পিতা : হরি মোহন গোপ, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গঙ্গানগর, উপজেলা : নাসিরনগর।

৪০. মহেশ দাস (২৫), পিতা : অজ্ঞাত, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গদাইনগর, উপজেলা : লাখাই।

৪১. দীগেন্দ্র আচার্য (৫০),পিতা : শ্রীশ আচার্য, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গঙ্গানগর, উপজেলা : নাসিরনগর।

৪২. দীনেশ বিশ্বাস (২৫), পিতা : রমেশ বিশ্বাস, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গঙ্গানগর, উপজেলা : নাসিরনগর।

৪৩. মনোরঞ্জন বিশ্বাস (২৫), পিতা : দেবেন্দ্র বিশ্বাস, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গঙ্গানগর, উপজেলা : নাসিরনগর।

৪৪. অনিল মাঝি (৩০), পিতা : তারা চাঁন মাঝি, পেশা : মাঝি, গ্রাম : সিতারামপুর, লালচাঁনপুর কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।

৪৫. ইদ্রিছ আলী (৬০),পিতা : সুরুজ আলী, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : মুড়িয়াউক, উপজেলা : লাখাই।

৪৬. আব্দুল জব্বার উরফে আবু মিয়া(৬৫), পিতা : সদর হোসেন, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : মুড়িয়াউক , উপজেলা : লাখাই।

৪৭. কিশোরী রায় (১৮), পিতা : মনোহর রায়, পেশা : গৃহিনী, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : লাখাই।

৪৮. তিতু মিয়া (১৮), পিতা : আব্দুল জব্বার, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : পূর্ব বুল্লা, উপজেলা : লাখাই।

৪৯. জিতু মিয়া, (৪৫), পিতা : কাছাই মিয়া মুন্সী, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : পশ্চিম বুল্লা, উপজেলা : লাখাই।

৫০. কাছম আলী (৪৬), পিতা : রমিজ আলী সর্দার, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : পশ্চিম বুল্লা, উপজেলা : লাখাই।

৫১. সানু মিয়া (৫০), পিতা : অজ্ঞাত, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : পশ্চিম বুল্লা, উপজেলা : লাখাই।

৫২. নন্দলাল দাশ (৪৫), পিতা : অজ্ঞাত, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : ভবানীপুর, উপজেলা : লাখাই।

৫৩. অর্ধন দাশ (৪২), পিতা : অজ্ঞাত, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : ভবানীপুর, উপজেলা : লাখাই।

পরিশিষ্ট-২

স্বাধীনতাবিরোধীদের তালিকা

১. মওলানা শফি উদ্দিন, পিতা: মতিউর রহমান, গ্রাম: মানপুর, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
২. তাজুল ইসলাম ফুকন, পিতা: সুধীন মিয়া, গ্রাম: মুড়িয়াউক, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
৩. জাহেদ মিয়া, পিতা: আশেক উল্লাহ, গ্রাম: মুড়িয়াউক, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
৪. মো. ছালেক মিয়া ওরফে ছায়েক, পিতা: আব্দুস সাত্তার, গ্রাম: মুড়িয়াউক, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
৫. লিয়াকত আলী, গ্রাম: মুরাকড়ি, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
৬. মওলানা নুরুল ইসলাম, গ্রাম: সিংহগ্রাম, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
৭. মওলানা মনসুর উদ্দিন, গ্রাম: বেগুনাই, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
৮. মওলানা ইসমাইল, গ্রাম: মুড়িয়াউক, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
৯. মওলানা আবু বক্কর, গ্রাম: ফুলবাড়িয়া, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
১০. রাশেদুল হাসান খান, গ্রাম: কাটিহারা, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
১১. রমিজ মিয়া, গ্রাম: পূর্ব বুল্লা, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
১২. খেলু মিয়া, গ্রাম: মুরাকড়ি, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
১৩. সালেক মিয়া, গ্রাম: জিরুন্ডা, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
১৪. আজিজুল হক, গ্রাম: রহিতাঙ্গী, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
১৫. এনামুল হক, গ্রাম: কাটিহারা, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।
১৬. দুলাই মিয়া, গ্রাম: বেগুনাই, উপজেলা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।

মুক্তিযোদ্ধা। শিল্পী : শাকুর